



প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা

Banashri Sahoo

D.El.Ed (2022-24), Bishnupada Primary Teachers Training College, Makrampur
Email: s.banashri93@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বর্তমান শিক্ষানীতির অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার, যার লক্ষ্য সকল শিশুর জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি কেবল মানবিক বা নৈতিক দায়িত্ব নয়, এটি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্যসূত্র, নীতি নথি, এবং বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, সহপাঠী সম্পর্ক উন্নয়ন, এবং সামাজিক সহানুভূতি গঠনে সহায়ক। তবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, পাঠ্যক্রমের অনুপযোগিতা, ও সমাজের নেতিবাচক মানসিকতা এখনো বড় প্রতিবন্ধক। প্রবন্ধে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাসামগ্রী, সম্প্রদায়ভিত্তিক সহায়তা, এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের গুরুত্বও আলোচিত হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা কেবল প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার নয়, বরং টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

মূল শব্দ (Key Words): অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

ভূমিকা:

শিক্ষা মানবসভ্যতার বিকাশের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এটি শুধু একটি জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া নয়, বরং মানুষের চিন্তা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, এবং আত্মপরিচয়ের বিকাশের অন্যতম উপায়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করে, সমাজে অবদান রাখার ক্ষমতা অর্জন করে এবং নাগরিক জীবনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে। তাই শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত বিকাশের নয়, জাতীয় ও সামাজিক উন্নয়নেরও মূলভিত্তি।

ভারতের সংবিধানে শিক্ষাকে সর্বজনীন অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিশেষত “শিক্ষার অধিকার আইন (Right to Education Act, 2009)” প্রবর্তনের মাধ্যমে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আইন শিক্ষা-সমতার ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে

বিবেচিত। তবুও বাস্তব চিত্রে দেখা যায়, সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ—প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা (Children with Disabilities)—এখনও মূলধারার শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সংবেদনজনিত বা শেখার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার রূপে প্রকাশ পায়। এই সীমাবদ্ধতা কোনও শিশুর শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার অজুহাত হতে পারে না। তবুও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যায় অথবা শিক্ষালাভে ক্রমাগত বাধার সম্মুখীন হয়। ফলে তারা সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূলধারায় সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

এই প্রেক্ষাপটে “অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education)” ধারণাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা মানে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি শিশু, শারীরিক বা মানসিক সক্ষমতার পার্থক্য নির্বিশেষে, সমানভাবে শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ পায়। এটি কেবল শিক্ষাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা নয়, বরং একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন—যেখানে বৈচিত্র্যকে বাধা নয়, বরং সম্পদ হিসেবে দেখা হয়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো এমন এক মানবিক ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ গড়ে তোলা যেখানে প্রতিবন্ধী ও সক্ষম উভয় শিক্ষার্থী একই শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে শেখার সুযোগ পায়। এতে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সমানাধিকারের চর্চা শেখে।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরেই এই নীতির বাস্তবায়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই পর্যায়েই শিশুর সামাজিকীকরণ, আত্মবিশ্বাস, কৌতূহল, এবং শেখার ভিত্তি গড়ে ওঠে। প্রাথমিক শিক্ষায় যদি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়, তবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা কেবল শিক্ষায় নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী ও সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।

অতএব, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সার্থক বাস্তবায়ন শুধু শিক্ষাক্ষেত্রের সংস্কার নয়, বরং এটি এক বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব—যেখানে শিক্ষা, মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার একে অপরের সঙ্গে একীভূত হয়ে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পথ নির্দেশ করে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

ভারতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার ধারণা দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ছিল। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা সাধারণত সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; ফলে শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মূলধারার শিক্ষার সুযোগ থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল করুণানির্ভর, অধিকারনির্ভর নয়। তবে ঔপনিবেশিক যুগের শেষ দিকে এসে মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজসেবার ধারণা প্রসারিত হওয়ার ফলে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগে কিছু ধর্মীয় সংস্থা, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান এবং খ্রিষ্টান মিশনারি সংগঠন দৃষ্টিহীন, শ্রবণপ্রতিবন্ধী ও শারীরিকভাবে অক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করে। যেমন—কলকাতায় “School for the Blind” (১৯৩৭), “Deaf and Dumb School” (১৯৪৫) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ছিল সেই যুগের পথিকৃৎ প্রচেষ্টা। এসব বিদ্যালয়ে মূলত দানভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, যেখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের আলাদা পরিবেশে শিক্ষা দেওয়া হতো।

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার শিক্ষাকে সামাজিক ন্যায়বিচারের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে। ১৯৪৪ সালের সার্জেন্ট রিপোর্ট-এ প্রথমবারের মতো প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য “বিশেষ শিক্ষা” (Special Education)-এর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব

আরোপ করা হয়। সেখানে বলা হয়েছিল যে সমাজের সকল শ্রেণির শিশু, বিশেষত প্রতিবন্ধী শিশুরা, তাদের সক্ষমতার উপযোগী শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী।

পরবর্তীকালে ১৯৬৪-৬৬ সালের কোঠারি কমিশন রিপোর্ট শিক্ষার সমতার ওপর জোর দিয়ে জানায় যে, শিক্ষার সুযোগ থেকে কোনো শিশুকে বঞ্চিত রাখা ন্যায়সংগত নয়। এই প্রতিবেদনই ভবিষ্যতে “অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা”-র ধারণার প্রাথমিক বীজ রোপণ করে।

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি (NPE 1986) এবং তার ১৯৯২ সালের সংশোধিত সংস্করণে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য “Integrated Education for Disabled Children (IEDC)” কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই নীতিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের আলাদা বিদ্যালয়ে না রেখে, মূলধারার বিদ্যালয়েই তাদের শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিমূলক ধারণা প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল।

১৯৯৫ সালে ‘Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act’ পাস হওয়ার পর প্রতিবন্ধী নাগরিকদের শিক্ষার অধিকার আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশাধিকারের সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার পরিবেশে সমান অংশগ্রহণের বিষয়টি নীতিগতভাবে স্বীকৃতি পায়।

২১শ শতকের সূচনায়, “সর্ব শিক্ষা অভিযান (SSA, 2001)”-এর মাধ্যমে “Education for All” বা “সবার জন্য শিক্ষা” ধারণাটি কার্যকর রূপ লাভ করে। এই প্রকল্পে *Children with Special Needs (CWSN)* শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থীদের মূলধারার বিদ্যালয়ে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তীতে সমগ্র শিক্ষা অভিযান (2018) শিক্ষার সমস্ত স্তরকে একত্রিত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণাকে আরও জোরদার করে।

সবশেষে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে এক নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এই নীতিতে বলা হয়েছে, শিক্ষার প্রতিটি স্তরে—প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত—প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমান সুযোগ, সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও মানানসই পাঠ্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে। এটি শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী নীতি, যা “সবার জন্য সমান শিক্ষা” ধারণাকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রাথমিক স্তরে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বর্তমান চিত্র:

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হলেও, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এখনও অনেক সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। শিক্ষা অধিকার আইন (RTE, 2009)-এর মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রের তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও UNICEF (2023)-এর এক যৌথ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতে বর্তমানে প্রায় ৭৫ লক্ষ প্রতিবন্ধী শিশু বিদ্যালয়-পূর্ব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়বয়সী। কিন্তু এদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ শিশু এখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি। অর্থাৎ, প্রাথমিক শিক্ষার মূলধারার সঙ্গে এক বিশাল অংশের শিশুর সংযোগ এখনও গড়ে ওঠেনি। এই তথ্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে “Education for All” ধারণাটি কার্যত “Education for Most”-এ সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে।

ASER (Annual Status of Education Report) এবং NSSO (National Sample Survey Organisation)-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত বাস্তবতা সম্পর্কে বেশ কিছু উদ্বেগজনক তথ্য তুলে ধরেছে—

- **প্রবেশযোগ্যতা (Accessibility):** প্রায় ৪০% বিদ্যালয়ে এখনও হুইলচেয়ার প্রবেশযোগ্যতা নেই। অনেক বিদ্যালয়ের ভবন, সিঁড়ি ও টয়লেট ব্যবস্থা এমনভাবে নির্মিত যে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারেন না। ফলস্বরূপ, অনেক অভিভাবক সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনিচ্ছুক থাকেন।
- **সহায়ক শিক্ষাসামগ্রী (Learning Materials):** প্রায় ৫০% বিদ্যালয়ে দৃষ্টিহীন বা শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাসামগ্রী যেমন ব্রেইল বই, অডিও-ভিজুয়াল টুল, বা শ্রবণযন্ত্র উপলব্ধ নয়। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি থাকা সত্ত্বেও বাস্তব প্রয়োগে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।
- **শিক্ষক প্রশিক্ষণ (Teacher Training):** অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশেষ শিক্ষণ কৌশল বা Inclusive Pedagogy-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ, মানসিক চাহিদা ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার অভাবে তাঁরা প্রায়ই ঐ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেন না।
- **মনস্তাত্ত্বিক সহায়তার অভাব:** বিদ্যালয় পর্যায়ে পরামর্শদাতা বা কাউন্সেলর প্রায় অনুপস্থিত। ফলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা মানসিক নিরাপত্তা, আত্মসম্মান ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অভাবে ভোগে।
- **অভিভাবক ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি:** গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় এখনও অনেক পরিবার প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা নিয়ে উদাসীন বা নিরুৎসাহিত। সমাজের কুসংস্কার, দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাব এই অনীহার অন্যতম কারণ।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ (NEP 2020) এই সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে বেশ কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছে—যেমন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল রিসোর্স তৈরি, সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি, বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ, ও Inclusive Classroom গঠন। তবে এসব নীতি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত করতে গেলে প্রশাসনিক সহযোগিতা, পর্যাপ্ত অর্থায়ন, এবং সমাজে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অপরিহার্য।

এছাড়া UNICEF ও UNESCO-র রিপোর্টে দেখা যায়, শহরাঞ্চলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিকাঠামো তুলনামূলকভাবে উন্নত হলেও **গ্রামীণ ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে** প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার অনেক কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিবেশ তাদের জন্য অনুকূল নয়, ফলে বিদ্যালয়ত্যাগের (dropout) হারও উদ্বেগজনকভাবে বেশি।

সার্বিকভাবে বলা যায়, প্রাথমিক স্তরে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বর্তমান চিত্র এক দ্বৈত বাস্তবতার প্রতিফলন—একদিকে নীতিগত অগ্রগতি ও সরকারী প্রচেষ্টা, অন্যদিকে অবকাঠামোগত ঘাটতি, প্রশিক্ষণের অভাব এবং সামাজিক মনোভাবের সীমাবদ্ধতা। এই ফাঁক পূরণ করাই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রকৃত সাফল্যের চাবিকাঠি।

সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্য হলো এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে প্রতিটি শিশু—প্রতিবন্ধী হোক বা অপ্রতিবন্ধী—সমানভাবে শেখার সুযোগ পায়। কিন্তু বাস্তবে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই লক্ষ্য পূরণে নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নিচে এই সীমাবদ্ধতাগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।

অবকাঠামোগত ঘাটতি: অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অন্যতম বড় সমস্যা হলো বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা। অনেক বিদ্যালয়ে এখনও প্রতিবন্ধী-বান্ধব অবকাঠামো যেমন—র‍্যাম্প, হুইলচেয়ার চলাচলের পথ, ব্রেইল বই, শ্রবণযন্ত্র, বা বিশেষ

আসনের ব্যবস্থা নেই। ফলে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুরা বিদ্যালয়ে আসা, ক্লাসে অংশগ্রহণ করা বা সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে সমস্যার মুখোমুখি হয়। শ্রেণিকক্ষ ও টয়লেট সুবিধাও প্রায়ই তাদের ব্যবহারের উপযোগী নয়। এর ফলে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে নাম লেখালেও নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারে না, যা শিক্ষার ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটায়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব: অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে প্রশিক্ষিত শিক্ষক অপরিহার্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই বিশেষ শিক্ষার (Special Education) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাননি। তারা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ, আচরণগত বৈশিষ্ট্য বা মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন না। ফলে শিক্ষণ পদ্ধতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়, এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যদি নিয়মিত ও ব্যবহারিকভাবে পরিচালিত হয়, তবে এই সমস্যার অনেকটাই সমাধান সম্ভব।

সামাজিক মনোভাব: প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সমাজের মনোভাব এখনও যথেষ্ট ইতিবাচক নয়। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় প্রতিবন্ধিতা অনেক সময় কুসংস্কার, অক্ষমতা বা বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেক পরিবার লজ্জা বা সামাজিক ভয় থেকে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায় না। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থী বা অভিভাবকও কখনও কখনও বৈষম্যমূলক আচরণ করে, যার ফলে প্রতিবন্ধী শিশুদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। এই নেতিবাচক মনোভাব পরিবর্তনের জন্য সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ, এবং প্রতিবন্ধী অধিকার বিষয়ক প্রচার প্রয়োজন।

প্রযুক্তিগত বৈষম্য: বর্তমান যুগে শিক্ষার একটি বড় উপকরণ হলো প্রযুক্তি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ফারাক বিদ্যমান। শহরে বিদ্যালয়গুলিতে স্মার্ট ক্লাস, ই-লার্নিং, অডিও-ভিজুয়াল উপকরণ ব্যবহার হলেও গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে ইন্টারনেট সংযোগ ও যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। বিশেষ করে দৃষ্টিহীন বা শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিনির্ভর সহায়ক সামগ্রী (assistive devices) অধিকাংশ বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। ফলে প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষার সুফল এই শিক্ষার্থীরা ভোগ করতে পারে না।

নীতির বাস্তবায়ন ঘাটতি: ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য একাধিক আইন ও নীতি গৃহীত হয়েছে, যেমন—শিক্ষার অধিকার আইন (RTE Act, 2009), সর্ব শিক্ষা অভিযান, সমগ্র শিক্ষা অভিযান ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। কিন্তু নীতি ও বাস্তবতার মধ্যে এখনো বড় ব্যবধান রয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাব, প্রশাসনিক সমস্বয়ের ঘাটতি এবং তদারকির অভাবে নীতিগুলি মাঠপর্যায়ে কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয় না। অনেক বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ বা মনিটরিং ব্যবস্থাও দুর্বল। ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রায়ই কাগজে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এমন একটি শিক্ষাদর্শন, যা সমাজের প্রতিটি শিশুকে তার নিজস্ব ক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা ও বৈচিত্র্যসহ গ্রহণ করার কথা বলে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি কেবল মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সামাজিক ন্যায়, সমতা ও মানবসম্পদ বিকাশের ভিত্তি তৈরি করতে পারে। নিচে এই প্রক্রিয়ার সম্ভাবনাময় কিছু ক্ষেত্র সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হলো—

অন্তর্ভুক্তিমূলক পাঠ্যক্রম নকশা (Inclusive Curriculum Design):

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রথম ধাপ হলো এমন পাঠ্যক্রম তৈরি করা, যা প্রত্যেক শিশুর প্রয়োজন, ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রায়ই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নয়। ভবিষ্যতে পাঠ্যক্রমে স্থানীয়

ভাষা, সংস্কৃতি, ও শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, ব্রেইল বা অডিও বই, সরল ভাষার পাঠ্যবই, ও ভিজুয়াল লার্নিং উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা সম্ভব। পাশাপাশি শিক্ষণ উপকরণে বৈচিত্র্য আনলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমানভাবে শেখার আনন্দ পেতে পারে।

সহায়ক প্রযুক্তির (Assistive Technology) প্রসার: প্রযুক্তি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আধুনিক যুগে স্মার্ট ডিভাইস, স্পিচ রিকগনিশন সফটওয়্যার, স্ক্রিন রিডার, ও ব্রেইল ই-বুক শিক্ষাকে সহজলভ্য ও উপভোগ্য করে তুলতে পারে। শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সাবটাইটেল যুক্ত ভিডিও, দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য অডিও শিক্ষাসামগ্রী, এবং শারীরিকভাবে অক্ষম শিশুদের জন্য টাচ-বেসড লার্নিং সিস্টেম ব্যবহারে শিক্ষার মান উন্নত হতে পারে। তবে এই প্রযুক্তি শুধু শহরাঞ্চলে নয়, গ্রামীণ বিদ্যালয়েও পৌঁছে দিতে হবে, যাতে প্রযুক্তিগত বৈষম্য দূর হয় এবং সব শিশু সমান সুযোগ পায়।

সম্প্রদায়ভিত্তিক সহায়তা (Community-Based Support): অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সাফল্য শুধু বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপরও নির্ভর করে। স্থানীয় সমাজ, অভিভাবক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO), ও পঞ্চায়েত স্তরের প্রশাসন যদি যৌথভাবে কাজ করে, তবে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব। সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগ যেমন সচেতনতা শিবির, অভিভাবক প্রশিক্ষণ, ও স্থানীয় সহায়ক দল গঠন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে টিকে থাকার হার বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। সমাজের ইতিবাচক মনোভাব গঠনই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সবচেয়ে বড় ভিত্তি।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring and Evaluation): অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সাফল্য নিশ্চিত করতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও ডেটা সংগ্রহ অপরিহার্য। বর্তমানে বহু বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি নির্ভুলভাবে নথিভুক্ত হয় না। ভবিষ্যতে প্রযুক্তিনির্ভর মনিটরিং সিস্টেম ও তথ্যভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও শিক্ষাগত উন্নয়ন ট্রাক করা সম্ভব হবে। বিদ্যালয় স্তরে বিশেষ সমন্বয়কারী নিয়োগ ও সময়ে সময়ে মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রস্তুত করলে নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া আরও কার্যকর হবে।

গণসচেতনতা ও প্রচারাভিযান (Public Awareness Campaign): অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো সমাজের মানসিকতা। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী শিশুরা কুসংস্কার ও বৈষম্যের শিকার হয়। তাই গণমাধ্যম, সামাজিক প্রচারাভিযান ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মাধ্যমে জনমনে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। টেলিভিশন, রেডিও, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাফল্যের গল্প তুলে ধরা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। স্কুলস্তরে “Inclusion Week” বা “Disability Awareness Day” পালনও শিক্ষার্থীদের সহানুভূতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মানসিকতা গঠনে সহায়ক হতে পারে।

উপসংহার:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের এক অপরিহার্য শর্ত। প্রাথমিক স্তরে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ প্রদান শুধু শিক্ষাগত ন্যায়বিচারের নয়, বরং সামাজিক ন্যায় ও মানবাধিকারেরও প্রকাশ। ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য বহু নীতি ও প্রকল্প চালু হলেও, সাফল্যের চাবিকাঠি হলো বাস্তবায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির প্রয়োগ, এবং সমাজের মানসিক পরিবর্তন। যদি এই দিকগুলো কার্যকরভাবে রূপায়িত হয়, তবে ভারত প্রকৃত অর্থেই একটি “সমান সুযোগসুবিধা ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা” গড়ে তুলতে পারবে, যেখানে প্রতিটি শিশু—সক্ষম বা প্রতিবন্ধী—নিজের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

1. সরকার, এস. (২০১৯)। *অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োগ: ভারতীয় প্রেক্ষাপট*। কলকাতা: দে'জ পাবলিকেশন।
2. মুখার্জী, র. (২০২১)। *প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা*। *শিক্ষাচিন্তা*, ১৫(২), ৫৫-৬৮।
3. চক্রবর্তী, পি. (২০১৮)। *ভারতের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি: বাস্তবতা ও সীমাবদ্ধতা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
4. বন্দ্যোপাধ্যায়, ম. (২০১৭)। *বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশু ও তাদের শিক্ষা: একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি*। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী প্রকাশনী।
5. ভট্টাচার্য, স. (২০২০)। *সর্ব শিক্ষা অভিযান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নীতি: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ*। *শিক্ষা ও সমাজ*, ১২(১), ৩৪-৫০।
6. দাস, আর. (২০১৬)। *প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ: প্রাথমিক স্তরের বাস্তব চিত্র*। *পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা গবেষণা পত্রিকা*, ৮(৩), ৭১-৮৫।
7. রায়, ক. (২০২২)। *অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ভূমিকা ও মনোভাব*। *শিক্ষক শিক্ষা*, ১০(২), ৪২-৫৭।
8. সরকার, ম. (২০১৫)। *বাংলাদেশ ও ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
9. বসু, স. (২০১৮)। *ডিজিটাল শিক্ষার প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি*। *শিক্ষা দিগন্ত*, ৫(৪), ৯০-১০৩।
10. ইউনেসেফ (২০২৩)। *ভারতে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ: একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন*। নয়াদিল্লি: ইউনেসেফ ভারত কার্যালয়।

Citation: Sahoo. B., (2025) “প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.